প্রথম আলো

তারিখ 19 AUG 2008
পৃঃ ৯ কলাম ৬

শুধু উপাচার্যদের অপসারণ নয়, সব অভিযোগের তদন্ত ও বিচার জরুরি

ইলিয়াস উদ্দীন বিশ্বাস

চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর চারদিকে হল দখল, জমি দখল, পদ দখল শুরু হয়ে যায়। দখলের এই মহোৎসবে উপাচার্যের পদ দখল ছিল বেশ আলোচিত। দখলকৃত পদে আসীন হয়ে উপাচার্যেরা দলীয়করণ, আত্মীয়করণ ও দুর্নীতির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর যে ক্ষতি সাধন করেছেন, তা কখনো পূরণ হওয়ার নয়। তাই বর্তমান সরকার এক এক করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে অপসারণ করে বলছে, 'জনস্বার্থে উপাচার্যকে অব্যাহতি দেওয়া হলো।' কিন্তু শুধু উপাচার্যদের অপসারণ করেই জনস্বার্থ রক্ষা হবে — এমন ভাবার কোন কারণ নেই। অভিযুক্ত উপাচার্যদের অপসারণের পাশাপাশি প্রয়োজন সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে তাদের আমালে দেওয়া বিভিন্ন অবৈধ নিয়োগ বাতিলসহ তাঁদের সব অপকর্মের বিচার।

২০০১ সালের ২০ জুলাই শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এম. হাবিবুর রহমানের মেয়াদ শেষে চতুর্থ উপাচার্য হিসেবে যোগদান করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক মো. সালেহ উদ্দিন। সে বছর চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় এলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতর ও বাইর থেকে উপাচার্যের ওপর নানা ধরনের অনৈতিক চাপ বাড়তে থাকে। তিনি অত্যন্ত সৎ, নির্লোভ ও আত্মসম্মান বোধসম্পন্ন এক ব্যক্তি। তিনি স্বার্থলোভীদের সঙ্গে কোনোরূপ আপস না করে সে বছরের ২৫ ডিসেম্বর উপাচার্য পদ থেকে পদত্যাগ করেন। তারপর উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য হিসেবে যথাক্রমে অধ্যাপক এম. শফিকুর রহমান ও অধ্যাপক মোসলেহ উদ্দিন আহমদ যোগদান করেন। উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাক্ট ও নীতিমালা লঙ্ঘন করে স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতেন। বিশেষ কর শিক্ষা-ছুটির ক্ষেত্রে তাঁর ভিন্ন মতাবলম্বী শিক্ষকদের হয়রানি করতেন। একজন শিক্ষককে তাঁর ন্যায্য শিক্ষা-ছুটির জন্য এক মাস প্রশাসনিক ভবনে অবস্থান ধর্মঘট করতে হয়। শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সম্মিলিত আন্দোলনের ফলে সরকার তাঁকে অপসারণ করে। উপাচার্যের দায়িত্ব পান উপ-উপাচার্য অধ্যাপক মোসলেহ উদ্দিন আহমদ। তাঁর দলীয়করণ, আত্মীয়করণ, অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ-প্রতিবাদের ঘটনা ঘটে। কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে বরং জোট সরকারের প্রভাবশালী অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহছানুল হক মিলন এবং প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরীর আশ্রয়-প্রশ্রয়ে উপাচার্য আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেন। মেধার কোনো মূল্যায়ন না করে দলীয় বিবেচনায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োগ দিতে থাকেন। শিক্ষক নিয়োগে তাঁর সাম্প্রদায়িকতা নগ্নভাবে প্রকাশ পায়। ২০০৫ সালে বিভিন্ন বিভাগের পাঁচজন শিক্ষকের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও অধ্যাপক পদের নিয়োগ বোর্ডকে প্রভাবিত করে তাঁদের পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দুর্দিনে কয়েকজন শিক্ষক উপাচার্যের অনিয়ম ও দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এনে তাঁর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা করেন। কিন্তু শুনানি শুরু হওয়ার আগেই ২০০৬ সালের ১৪ মে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র নিহত হওয়ার মর্মান্তিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্রবিক্ষোভের মুখে উপাচার্য পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। সেদিন তিনি উপাচার্যের বাসভবন থেকে দুই ট্রাকভর্তি মালপত্র নিয়ে যান। বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা নিরসনে সব অনুষদের ডিন এবং বিভাগীয় প্রধানেরা পৃথক দুটি চিঠিতে একজন সৎ ও যোগ্য উপাচার্য নিয়োগের জন্য প্রধানমন্ত্রী ও চ্যান্সেলরের কাছে অনুরোধ করেন। কিন্তু প্রায় দুই মাস পর প্রভাবশালী মন্ত্রীদের আশীর্বাদ পাওয়া পদত্যাগী উপাচার্য পুনরায় ক্যাডার বেষ্টিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন! সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা তাঁর এই ফিরে আসাকে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেনি। তিনি ১৯ জুলাই একাডেমিক কাউন্সিলের সভা আহ্বান করলে অনেক সদস্যই এই উপাচার্যের সভাপতিত্বে সভায় বসতে অসম্মতি জানিয়ে চিঠি দেন। তবে সেদিন তাঁর আজ্ঞাবহ কিছুসংখ্যক সদস্য নিয়ে তিনি একাডেমিক কাউন্সিলের সভা করে শিক্ষাকার্যক্রম শুরু করার ঘোষণা দেন। কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা লাগাতার ক্লাস বর্জন করে। বিশ্ববিদ্যালয়কে সচল করতে না পারলেও তিনি আবার নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করেন। এই নিয়োগ-বাণিজ্য বন্ধ করতে প্রগতিশীল শিক্ষকেরা প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান ধর্মঘট করলে তিনি শিক্ষকদের ওপর তাঁর পেটোয়া বাহিনীকে লেলিয়ে দেন! ফলে শিক্ষকেরা দুর্নীতির নানা অভিযোগে অভিযুক্ত এই উপাচার্যকে অপসারণ করে বিশ্ববিদ্যালয় সচল করার দাবিতে প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান ধর্মঘটের ডাক দেন। একটানা ৪৩ দিন অবস্থান ধর্মঘটের পর জোট সরকারের ঠিক অন্তিম সময়ে চ্যান্সেলর তাঁকে অপসারণ করে ২৩ অক্টোবর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপ-উপাচার্য ড. এম. আমিনুল ইসলামকে উপাচার্য পদে নিয়োগ দেন। তিনি যোগদান করেই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গঠিত তদন্ত কমিটির অনুসন্ধানে অভিযোগ করা হয়েছে যে, সাবেক উপাচার্য সেদিন ট্রাকযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাড়ে ১৯ লাখ টাকার সম্পদ নিয়ে গেছেন।

জোট সরকার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত উপাচার্য অধ্যাপক সাইদুর রহমান খানকে অপসারণ করে উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য হিসেবে যথাক্রমে অধ্যাপক ফাইসুল ইসলাম ফারুকী ও অধ্যাপক শাহাদত হোসেন মণ্ডলকে নিয়োগ দেয়। জামায়াত-বিএনপির স্থানীয় নেতাদের তুষ্ট করে উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য পদে নিয়োগ লাভ করেন বলেই সেসব নেতাকে খুশি করতে তাঁরা সম্পূর্ণ দলীয় বিবেচনায় শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ দেন। বিশেষ করে ২০০৪ সালে কোনোরূপ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই ৫৪৪ জন কর্মচারী নিয়োগ ছিল দলীয়করণের এক চরম উদাহরন। এসব কর্মচারী নিয়োগে অর্থ লেনদেনের গুরুতর অভিযোগও উঠেছে। অথচ সেসব কর্মচারী এখনো বহালতবিয়তে। জোট সরকারের আমলে প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দলীয়করণ, আত্মীয়করণ, অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু জোট সরকার দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত উপাচার্যদের বিরুদ্ধে কোনোরূপ ব্যবস্থা না নিয়ে বরং তাঁদের বিভিন্নভাবে পুরস্কৃত করেছে। যেমন বহু অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত ও অবৈধভাবে ৫৪৪ জন কর্মচারীর নিয়োগদাতা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপ-উপাচার্য শাহাদত হোসেন মণ্ডলকে সরকারি কর্মকমিশনের সদস্য পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। এধরণের লোকজন সরকারি কর্মকমিশনে নিয়োগ পাওয়ার ফলে প্রকৃত মেধাবীরা বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি পায়নি, বরং দলীয় ক্যাডাররা চাকরি পেয়েছে। আর এটা প্রমাণিত সত্য বলেই গত বছর সরকারি কর্মকমিশন ১৭তম বিসিএস পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল বাতিল করে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের পুনরায় মৌখিক পরীক্ষা নিয়েছে। কর্মকমিশনের আরেক সাবেক সদস্য অধ্যাপক মাহফুজুর রহমানের বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের নানা তথ্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে; বর্তমানে তিনি আত্মগোপনে আছেন। তাঁদের কারণে শিক্ষকতা নামের একসময়ের মহান পেশাটি আজ প্রশ্নবিদ্ধ।

বর্তমান সরকার দুর্নীতিবাজ উপাচার্যদের অনেককেই অপসারণ করেছে বটে, তবে তাঁদের কাউকে আইনের মুখোমুখি করেছে বলে আমার জানা নেই। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের তদন্ত কমিটি ৩ থেকে ৫ আগস্ট রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সব অনিয়ম ও দুর্নীতির তদন্ত করেছে। তবে এ তদন্তে দুর্নীতিবাজদের কোনো কিছু হবে বলে মনে হচ্ছে না। কেননা, এক বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের তদন্ত কমিটি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাহজালাল) অনিয়ম ও দুর্নীতির তদন্ত করলেও দুর্নীতির নানা অভিযোগে অভিযুক্ত সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক মোসলেহ উদ্দিন আহমদ আজও ধরা-ছোঁয়ার বাইরে! তবে এ কথাও সত্য যে সব অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে সে জন্য কেবল একা উপাচার্য দায়ী নন। তাঁর গ্রুপের শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতারাও অনেকাংশে দায়ী। তাঁরা উপাচার্যকে চাপ দিয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করেন। তাঁরা মনে করেন উপাচার্য তাঁদের দলীয় লোক, কাজেই তিনি তাঁদের দিকনির্দেশনায় চলবেন। তাই উপাচার্যকে উদ্দেশ্য করে একজন শিক্ষককে বলতে শোনা গেছে, 'আপনি ডিগ্রি করেছেন নিজ যোগ্যতায়, প্রফেসর হয়েছেন নিজ যোগ্যতায়, কিন্তু উপাচার্য হয়েছেন জাতীয়তাবাদী দলের কৃপায়।' তিনি এ কথার মাধ্যমে কী বোঝাতে চেয়েছেন, তা সহজেই অনুমেয়। এ ধরনের শিক্ষকের কারণেই একজন উপাচার্য অনেক সময় নিরপেক্ষ থাকতে পারেন না। দলীয় লেজুড়বৃত্তির কারণেই শিক্ষকসমাজের এত অধঃপতন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো পবিত্র অঙ্গন থেকে দলীয়করণ, আত্মীয়করণ, সাম্প্রদায়িকতা অনিয়ম ও দুর্নীতি দূর করতে না পারলে মেধাবীদের স্থান বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ক্রমশ মেধাশূন্য হয়ে পড়বে, যা হবে জাতির জন্য বড় ধরনের বিপর্যয়। এ বিপর্যয় থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে অবৈধ নিয়োগ বাতিলসহ দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং সহযোগীদের বিচার করতে হবে। যেন ভবিষ্যতে আর কেউ অনিয়ম ও দুর্নীতি করতে সাহস না পায়। আর তখনই জনস্বার্থ রক্ষা হবে।

> বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো পবিত্র অঙ্গন থেকে দলীয়করণ, আত্মীয়করণ, সাম্প্রদায়িকতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি দূর করতে না পারলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ক্রমশ মেধাশূন্য হয়ে পড়বে। তা হবে জাতির জন্য বড় ধরনের বিপর্যয়। এ থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে অবৈধ নিয়োগ বাতিলসহ অভিযুক্ত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং সহযোগীদের বিচার করতে হবে। যেন ভবিষ্যতে আর কেউ অনিয়ম ও দুর্নীতি করতে সাহস না পায়।

ড. ইলিয়াস উদ্দীন বিশ্বাস: অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, গণিত বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।